OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 87 - 96
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ছোটগল্প : Fictionalised History or Historical Fiction?

সোহিনী মিশ্র
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: bristilekha97@gmail.com
0009-0004-9459-1151

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Sharadindu Bandyopadhyay, The historical short stories of Sharadindu Bandyopadhyay, Pragjyotish, Rokto-Sandhya, Chuyachandan, Bishkanya, Sankhya-Kankan, Bengali Historical literature.

Abstract
The primary objective of historical fiction is to portray the social, political, cultural, and economic backdrop of a specific historical era. Authors bring to light lesser-known historical events or figures, infusing them with the essence of their imagination to craft literary narratives; there is no doubt that Sharadindu Bandyopadhyay was a master of this art. A wide array of figures—ranging from Tathagata Buddha to Mahaprabhu Sri Chaitanya, and from Atish Dipankara to Malik Kafur—have been vividly brought to life through Sharadindu's pen. Sharadindu encompassed a vast span of history in his writings, ranging from the arrival of the Aryans in India to the India of the twentieth century. Yet, was his focus limited merely to history or historical figures? Far from it; his aim was to portray contemporary society and politics beyond the confines of history books. Thus, in 'Shankhya-Kankan', we witness Mayur being wounded by an assassin, while in 'Bishkanya', we see the Emperor of Magadha, Chanda, being oppressed by his own subjects. The truth is, Sharadindu Bandyopadhyay was a writer more than a history enthusiast. Yes, he loved history but his main focus was on the plot and character development of the story. That's why many of his stories are about people, culture and life that are coated in the timeline of history. And that is precisely why his stories have become all the more engaging and vivid. The narrative structure of his tales transports readers—at once—to the era of the Buddha's spiritual quest, while simultaneously plunging them into the turbulent waves of the ocean alongside Vasco-da-Gama's fleet.

It is not possible to analyze all of Sharadindu's novels and short stories within the scope of this brief essay; therefore, we have selected five stories from his rich repertoire. Those stories are 'Pragjyotish', 'Rokto-Sandhya', 'Chuyachandan', 'Bishkanya' and 'Sankhya-Kankan'. Each of these stories speaks of different times and people—some are deeply rooted in history, while others take flight on the wings of imagination. Through these stories, we aim to highlight the historical consciousness embedded in Sharadindu's short fiction.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তিনি ব্যোমকেশ বক্সীর জন্য বিখ্যাত হয়ে থাকলেও, সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে তাঁর যে রচনাগুলি বাঙালি পাঠককে অভিভূত করে সেগুলি হল তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্প। শুধুমাত্র সাহিত্যগতভাবেই নয় ইতিহাস-নির্ভরতার দিক থেকেও রচনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এই রচনাগুলিতে অদ্ভুত ভাবে ইতিহাস ও কল্পনার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ইতিহাস ঠিক কোন স্থানে পুঁথিগত তথ্যকে অতিক্রম করে কল্পনায় প্রবেশ করে তা আলাদা করে বোধগম্য হয় না। তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, তথাগত বুদ্ধ, আলাউদ্দিন খিলজী, ভাস্কো-ডা-গামা, মহাকবি কালিদাস, শিবাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নির্দ্বিধায় স্থান করে নেয় তাঁর বইয়ের পাতায়। শরদিন্দুর লিখনশৈলী এতটাই নিখুঁত যে এই চরিত্রগুলিকে কাল্পনিক চরিত্রের সাথে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে দেখলেও আমাদের অস্বাভাবিক লাগে না। সেখানে চরিত্রগুলি হয়ে ওঠে কোথাও নায়ক, খলনায়ক অথবা সহনায়ক। আপন কলমের জাদুবলে শরদিন্দু অচিরেই ইতিহাস ও কল্পনার মধ্যিখানের সেই রেখাটিকে মুছে ফেলতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান –

> "শরদিন্দু বাবুর প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দূরকালের সামান্য কয়খানা ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন। এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে রমেশচন্দ্রের ছিল। ... প্রাণিতত্ত্ববিদেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের এক-আধখানা অস্থির ভগ্নাংশ পাইলে সমগ্র জন্তুটির আকৃতি সংগঠন করিতে পারেন; কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা তার চেয়েও বিস্ময়কর শক্তি। ইহার বলে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। শরদিন্দুবাবুর এই শক্তি আছে।"[১]

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি ছোটগল্প, যথাক্রমে 'প্রাগজ্যোতিষ', 'রক্ত-সন্ধ্যা', 'চুয়াচন্দন', 'বিষকন্যা' ও 'শঙ্খ-কঙ্কণ'। এই পাঁচটি গল্পকে নির্বাচন করার কারণ হল এই পাঁচটি গল্পেই আলাদা আলাদা সময়কাল এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র ফুটে উঠেছে। এই পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে শরদিন্দুর ঐতিহাসিক রচনাগুলির ইতিহাস-নির্ভরতাকে খুঁজে বের করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের ভূমিকায় শরদিন্দু লিখেছেন—

> "আমার কাহিনী Fictionised History নয় Historical Fiction",[২]

এর আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, যে তাঁর কাহিনি কাল্পনিক ইতিহাস নয়, বরং ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য। অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র ইতিহাসের Missing Link খুঁজে বের করে তার মধ্যে আপনার কল্পনার ফসলকে রোপণ করতে চাননি, বরং প্রচলিত অথবা স্বল্প পরিচিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, যে কোনো একটি বিশেষ চরিত্র বা ঘটনা তাঁকে এতটাই মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে যে তিনি তা নিয়ে কিছু লিখতে চেয়েছেন। যেমন - 'চুয়াচন্দন' গল্পটি লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "চুয়াচন্দন লিখে খুব তৃপ্তি হয়েছিল। মুঙ্গেরে স্কুলের টিচার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ'বার লিখেছিলাম। যতক্ষণ না লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই।"[৩]

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে তাঁর রচনাগুলির মূলধন ছিল ইতিহাস। কোথাও কোথাও তাঁর ইতিহাস-প্রেম এতই গভীর হয়ে উঠেছে যে কাহিনির সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও চরিত্রগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পে কাহিনি সম্পূর্ণভাবে কল্পনাপ্রসূত হলেও সেখানে চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের কথা বলা হয়েছে। আর এইসব কারণেই কোথাও কোথাও ইতিহাস ও কল্পনার মধ্যে এক দোলাচলতার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে নির্বাচিত পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে সেই দোলাচলতা এবং তার মধ্যে নিহিত ইতিহাস এবং কল্পনার সূক্ষ্ম মায়াজালটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ছোটোগল্প : সামগ্রিক আলোচনা— ইতিহাস-নির্ভর কাহিনির মাধ্যমেই আমাদের দেশে গদ্যগল্পের সূচনা। উনবিংশ শতাব্দীতে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে ইতিহাসকেন্দ্রিক কিছু গল্প লিখেছিলেন। শশিচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে এরপর এলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শশিচন্দ্রের স্নেহলালিত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাখালদাস ছিলেন ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসের লেখক, তাই তাঁর উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফলই পাওয়া যেত।

এরপর এলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ঐতিহাসিক ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে উদ্ধার করার কোনো মহান ব্রত তিনি অবলম্বন করেননি। শরদিন্দু ছিলেন ইতিহাস-পিপাসু পাঠক, তাই তাঁর রচনায় তিনি ইতিহাসের নাগাল পেতে চেয়েছেন মাত্র, তাকে জোর করে উপন্যাসের ফ্রেমে চেপে ধরতে চাননি। আর তাই তাঁর রচনাগুলি ইতিহাসের দরজায় কড়া নেড়েও কোথাও গল্পরসের হানি ঘটায়নি।

তাঁর পূর্বসূরিরা তাঁদের উপন্যাসে প্রধানত মোগল অন্তঃপুর, শাহী দরবার বা আরাবল্লীর গিরিদুর্গে ঘোরাফেরা করেছেন। অন্যদিকে শরদিন্দু মুসলমান যুগের ওপর ৩-৪টির বেশি গল্প লেখেননি, দুটি গল্প ছিল আলাউদ্দিন খিলজীর সময়কালের (‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ ও ‘রেবা-রোধসি’), ‘বাঘের বাচ্চা’ গল্পটি শিবাজীর সময়ের এবং শাহ সুজার সময়কালকে ঘিরে লেখেন ‘তক্ত মোবারক’। তাঁর ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘চুয়াচন্দন’ গল্প দুটির সময়কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী এবং চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী নিয়ে লেখা ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘অষ্টম সর্গ’ ও ‘মরু ও সঙ্ঘ’। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী-কেন্দ্রিক ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘সেতু’। আর্যদের আগমনের গোড়ার দিককার সময়কে দেখানো হয়েছে ‘প্রাগজ্যোতিষ’ গল্পে, এবং তারও আগেকার সময়কে তুলে ধরা হয়েছে ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে। ‘রুমাহরণ’ গল্পটির কাল প্রাচীন, তবে অনির্দিষ্ট আর ‘আদিম’ গল্পটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া। বাকি ‘চন্দন-মূর্তি’ গল্পটির প্রেক্ষাপট বিংশ শতাব্দী।

দূরকালের ইতিহাসকে বর্তমান সময়ে ধরে আনার যে অভিনব কৌশল শরদিন্দু গ্রহণ করেছিলেন তা হল জাতিস্মর কল্পনা। তিনি জাতিস্মরে বিশ্বাস করতেন কিনা জানা যায় না, তবে জাতিস্মরতাকে প্রতিপন্ন করে তিনি বেশ কিছু গল্প রচনা করেছেন, এমনকি তাঁর একটি গ্রন্থের নামও দিয়েছিলেন ‘জাতিস্মর’।

তাঁর ১৭টি ঐতিহাসিক গল্পের মধ্যে পাঁচটি তিনি বৌদ্ধ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। বৌদ্ধধর্মের এবং বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের ওপর যে শরদিন্দুবাবুর বিশেষ টান ছিল তা বলাই বাহুল্য। তার কারণ মূলত এই যে, তাঁর জীবনের একটি বড় সময় কেটেছিল দক্ষিণ মগধ অঞ্চলে, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর চাক্ষুস অভিজ্ঞতা ছিল। বৌদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে শরদিন্দুবাবুর আগ্রহ যে কী গভীর তার পরিচয় পাওয়া গেছিল তাঁর ‘মরু ও সংঘ’ গল্পটিতে। তবে শুধুমাত্র বৌদ্ধযুগ নয়, ইতিহাসই ছিল তাঁর আসল ভালোবাসার জায়গা। তাই শরদিন্দু অমনিবাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি স্বীকার করেছেন—

> “ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। মনে কেমন একটা সেন্স অফ ফুলফিলমেন্ট হয়। ‘গৌড় মল্লার’ ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ লেখার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। ‘চুয়াচন্দন’ লিখেও তাই হয়েছিল।”[৪]

আর তাই হয়তো তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টির থেকে সেই যুগ এবং কালকে ফুটিয়ে তোলার পিছনে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি। সেই সময়কার গল্প, তখনকার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র, আহার-বিহার, বাড়িঘর প্রভৃতি তাঁর রচনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটে উঠেছে। বর্তমানে নির্বাচিত পাঁচটি গল্প এবং তাতে নিহিত ইতিহাসের পদচিহ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাগজ্যোতিষ : ‘প্রাগজ্যোতিষ’ গল্পটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘বিষকন্যা’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে শরদিন্দু বলেছেন—

> "যাহাদের আমরা আর্য জাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনে এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধহয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুঁথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত— মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই।"[৫]

ইতিহাস বলে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার থেকে এক হাজার অব্দের মধ্যে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসে। এই আর্যজাতির একটি শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পর্বতশ্রেণি অতিক্রম করে পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এরা ক্রমশই পূর্ব দিকে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে এবং দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যেই উত্তরাপথের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করে। কেউ কেউ অনুমান করেন, মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম কীকট। এই কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে 'ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টক' রচনাকালে পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্যগণের কাছে মগধের অস্তিত্বের কথা জানা ছিল। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আর্যাবর্তের পূর্ব সীমান্ত যখন আর্য উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন এই সকল দেশে কোন জাতির বাসস্থান ছিল? 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ বঙ্গ ও মগধবাসীদের সঙ্গে 'চের' জাতির একটি উল্লেখ লক্ষ করা যায়। আর্যরা যাদের পক্ষী জাতীয় মানুষ বলে মনে করতেন, তারা এই একই বংশোদ্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য উপত্যাকায়, যে সমস্ত বর্বর জাতিদের চেরো বা চেরু বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে তারা আর্যবংশজাত নয়। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তারা আসলে দ্রাবিড় জাতীয়। আমাদের এই 'প্রাগজ্যোতিষ' গল্পের কোদন্ড উপজাতিকেও আমরা এই একই শ্রেণিভুক্ত করতে পারি। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদরা স্থির করেছেন যে, এই দ্রাবিড়গণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বাস করছেন। এবং এরাই ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বাবিরুষ অধিকার করে, বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এরা দ্রাবিড় বা তামিলভাষা নামক অনার্য ভাষায় কথা বলত, যা বর্তমানে তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালয়ালম এই চারটি প্রধানভাগে বিভক্ত। ফলে বোঝা যাচ্ছে, দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির বিবিধ পার্থক্য থাকলেও, মূল পার্থক্য ছিল ভাষার। আর্যরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অংশ, অতএব তারা সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলত, অন্যদিকে অনার্যরা মূলত দ্রাবিড় ভাষা বংশের অন্তর্গত। এই কারণে প্রথম দিকে কেউ কারোর ভাষা বুঝতে বা বলতে পারত না। পরবর্তীকালে অবশ্য ক্রমাগত বিবাহ-বন্ধন এবং যৌন মিলনের ফলে আর্য এবং অনার্য গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যা ক্রমান্বয়ে বর্তমানকালের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছে।

'প্রাগজ্যোতিষ' গল্পটিও এমনি এক সমন্বয়ের কথা বলে। দুই আর্য বীরপুরুষ প্রদ্যুম্ন ও মঘবা কৃষ্ণকায় দস্যু তস্করদের তাড়িয়ে স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠল, রাজা হবে কে? দুজনের কেউই বন্ধুকে বঞ্চিত করে রাজা হতে চায় না। শেষমেশ ঠিক হল যে প্রত্যেক সূর্যগ্রহণে রাজা পরিবর্তন হবে, প্রথমে মঘবা ও পরে প্রদ্যুম্ন। এরপর মঘবা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য জাতিকে পরাজিত করে তাদের রাজকুমারী এলাকে বিবাহের জন্য হরণ করে নিয়ে আসে। কিন্তু সমস্যা হল এলা আর্য ভাষা জানে না, তাই প্রদ্যুম্নের ওপর ভার পড়ল তাকে নিজেদের ভাষা শেখানোর। এই স্থানে কোদণ্ড উপজাতির কথা কিঞ্চিত বলে নেওয়া প্রয়োজন। কোদণ্ডরা অনার্য উপজাতি হলেও তাদের অহংবোধ ছিল প্রবল। গল্পে দেখা যায় মঘবার দ্বারা পরাজিত হলেও রাজকন্যা হরণের কথা জানতে পেরে পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার ফিরে আসে এবং মঘবাকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানায়। পরে আমরা জানতে পারি যে মঘবা এইবার আর কোদণ্ডদের পরাজিত করতে পারেনি, বরং রাজকুমারী এলাকে বিবাহের শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে এসেছে। গল্পের সূত্রে আমরা আরও জানতে পারি যে, কোদণ্ড উপজাতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসী। এখানে কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়,যা কিয়দাংশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পের শেষে দেখা যায়, এলা এবং প্রদ্যুম্ন উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে এবং প্রদ্যুম্ন নিজে রাজা হয়ে এলাকে বিবাহ করেছে। আর্য রাজত্বের কৈশোরাবস্থায় আর্য ও অনার্যের ক্রমাগত বিরোধ এবং পরবর্তীকালে সমন্বয়ের চিত্রটিকে তুলে ধরাই এই গল্পে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।

রক্ত-সন্ধ্যা : 'রক্ত-সন্ধ্যা' সম্ভবত শরদিন্দুর সর্বাপেক্ষা ইতিহাস-নির্ভর গল্পগুলির মধ্যে একটি। গল্পটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র 'ফিরিঙ্গি বণিক' বইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। কালিকট বন্দরে ভাস্কো-ডা-গামার পদার্পণ,

তাঁর সাথে মির্জা দাউদ ও অন্যান্য বণিকদের সংঘাত এবং শেষে ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক সমুদ্রবক্ষে দাউদ ও তাঁর পরিবারের হত্যা, মূলত এই হল গল্পটির সারাংশ।

ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত ঘটনাবলি কিছুটা এরকম— পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালের ২০শে মে ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। তিনিই প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরকে সংযুক্ত করে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ডা-গামা ভারতে এসেছিলেন মূলত দু'বার। তাঁর প্রথম যাত্রায় সাথী ছিলেন পেরো ডি অ্যালেনকুয়ার, পেদ্রো এসকোবার, জোয়াও ডি কোইমব্রা এবং আফোনসো গনসালভেস। কালিকটের তৎকালীন রাজা জামোরিন (সামুথেরি) তখন তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী পোন্নানিতে ছিলেন। বিদেশি নৌ-বহর আগমনের খবর শুনে তিনি কালিকটে ফিরে আসেন এবং কমপক্ষে ৩০০০ সশস্ত্র নায়ারের একটি বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে অতিথিকে আমন্ত্রণ করেন। ডা-গামাও জামোরিনকে বেশকিছু মূল্যবান উপহার পাঠান, তবে তা জামোরিনকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও কালিকটের মুসলিম বণিকরা মনে করেছিলেন যে ডা-গামা একজন সাধারণ জলদস্যু মাত্র, রাজকীয় রাষ্ট্রদূত নয়। ফলে তাদের সাথে ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁর সঙ্গীদের বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এর চার বছর পর তিনি পুনরায় তৃতীয় ভারতীয় আর্মাডা অভিযান শুরু করেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রক্ত-সন্ধ্যা' গল্পে মোটামুটি ভাবে এই ইতিহাসকে মেনে চলেছেন, এমনকি ডা-গামার সঙ্গী পেদ্রোর কথাও ভোলেননি। শুধুমাত্র মির্জা দাউদ নামটি নিয়ে সংশয় থেকেই যায়, কোথাও কোথাও এই বিদ্রোহী মুসলিমদের মধ্যে গোলাম হোসেন নামটি পাওয়া গেলেও মির্জা দাউদের নাম উল্লেখিত হয় না, যদিও মির্জা দাউদ চরিত্রটিই এই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু।

কাহিনি শুরু হয় জাতিস্মর গোলাম কাদেরের পূর্বজন্মের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে। পূর্বজন্মে তার নাম ছিল মির্জা দাউদ বিন গোলাম সিদকী। সে ছিল কালিকট বন্দরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তার একুশখানি বাণিজ্যতরী, হোয়াংহো থেকে নীলনদের প্রান্ত পর্যন্ত তাদের গতিবিধি এবং স্বয়ং রাজা সামরী তাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। সে ধর্মে মুসলমান হলেও একপত্নীক। কালিকটের সকল মানুষই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। এমন সময় সমুদ্রের বুক ভেদ করে তিনটি পোর্তুগিজ জাহাজে কালিকটে পদার্পণ করলেন ভাস্কো-ডা-গামা। প্রথম থেকেই মির্জা দাউদের সঙ্গে ডা-গামার সখ্য গড়ে উঠেনি। কিন্তু যখন দাউদ লক্ষ করে যে ডা-গামা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা অপদার্থ, পণ্যও দ্বিগুণ, চতুর্গুণ দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে, তখন থেকেই দাউদের সন্দেহ প্রবল হতে থাকে যে এই ফিরিঙ্গি বণিক কেবল ব্যবসা করতে ভারতবর্ষে আসেনি। গল্পের প্রথমাংশের শেষে মির্জা দাউদ ভাস্কো-ডা-গামাকে পরাজিত করে এবং ডা-গামা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কালিকট ত্যাগ করে।

কাহিনির পরবর্তী অংশে চার বছর পরের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

> "মির্জা দাউদ সপরিবারে মক্কাশরীফ দর্শন করে কালিকটে ফিরছিলেন। এমন সময় পাঁচটি ফিরিঙ্গী জাহাজ পিছন থেকে এসে তাদের আক্রমণ করল। এই জাহাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা। জাহাজে রক্ষিত সমস্ত অর্থ এবং নারীদের সমস্ত অলঙ্কার আত্মসাৎ করার পরেও পর্তুগিজ জলদস্যুদের খিদে মেটে না, তারা জাহাজে থাকা নারীদেরও দাবি করে। কালকূটের মতো গামা বলে ওঠে, "মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস। তোর স্ত্রীকে আমি বাঁদি করিয়া রাখিব।"[৬]

আর এখানেই লেখক ভাস্কো-ডা-গামা তথা বিদেশিদের নৃশংস এবং ঘৃণ্য চরিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে ভাস্কো-ডা-গামা নিজের হাতে দাউদ ও তার পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করেন এবং তীর্থযাত্রীদের জাহাজটিকে সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত করেন।

চুয়াচন্দন : 'চুয়াচন্দন' গল্পের একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র হলেন নিমাই পণ্ডিত। আমরা জানি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নদীয়ার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতৃ-প্রদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। কিশোরাবস্থাতেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটলে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি ব্যাকরণ সূত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে অধ্যাপনার

জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। তর্কশাস্ত্রে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। সমগ্র 'চুয়াচন্দন' গল্প জুড়েই লেখক এই নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সাহস এবং লোকপ্রেমের গাথা রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ যে এই গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, তা প্রকাশ পায় কানভট্টের উক্তিতে। নিমাই পণ্ডিত তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করলে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করেন—

> "বিশ্বম্ভর, এতদিন জানতাম তুমি নিপাতনে সিদ্ধ, এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"[৭]

এ প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। ভক্তি আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মূল বিষয়টি হল জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ। জাতিগত কঠোরতার বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের গুণ ও কর্মের ওপর গুরুত্ব প্রদান করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভক্তিমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে প্রধানত বিষ্ণু ও শিবের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস থেকে, তবে পরবর্তীকালে তা ধর্মের ভেদাভেদকে ভেঙে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এক মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই আন্দোলনেরই এক জননায়ক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ২৪ বছর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হয়ে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানে ভক্তিবাদের প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মতে জীবপ্রেমের দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, শুচি-মুচি কোনো ভেদাভেদই ছিল না। একদিকে যেমন- যবন হরিদাস তাঁর শিষ্য ছিলেন, তেমনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর এখানেই তাঁর ভক্তিভাব অচিরেই মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে।

এছাড়াও এই গল্পে লেখক তৎকালীন নদিয়া তথা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতা এবং ঘোর বামাচারকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই গল্পের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই—

> "তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল, রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে— তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালি অন্ধ-মত্ততার অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।"[৮]

'চুয়াচন্দন' গল্পের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র চন্দন দাস বাণিজ্যযাত্রায় গিয়েছিল। দীর্ঘ একবছর নয় মাস পর সে দেশে ফিরছে এবং একদিনের জন্য নবদ্বীপের ঘাটে নৌকা বেঁধেছে। এই ঘাটেই চন্দনের দেখা হয় চুয়ার সাথে। চুয়ার ভুবন-ভোলানো রূপে চন্দন মুগ্ধ হয় এবং তাকে বিবাহ করতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু চুয়ার জীবন বেষ্টন করে আছে দুর্ভাগ্যের এক করাল ছায়া। চুয়ার যখন সাত বছর বয়স, তখন তার পিতা কাঞ্চনদাস বাণিজ্য করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে মারা যান। এর একবছর পর তার মাও মারা যায়। চুয়ার যখন দশ বছর বয়স, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু এই সময় একদিন জমিদারের মহাপাষণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব চুয়াকে দেখে তাকে পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়। সে হুকুম দেয় যে ষোলোবছর পর্যন্ত চুয়া কুমারী থাকবে, তারপর মাধব এসে তাকে নিয়ে যাবে। চুয়াকে তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার পদে নিযুক্ত করা হবে। তান্ত্রিক সাধনার নামে যে মাধবই চুয়াকে ভোগ করবে, একথা বুঝতে কারো বাকি রইল না। কিন্তু মাধবের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতেও সাহস করল না। উল্টে চুয়াদের সমাজচ্যুত করা হল। গল্পের পরবর্তী অংশে নিমাই পণ্ডিতের সহায়তায় চন্দন কর্তৃক সুকৌশলে চুয়ার উদ্ধার ও তাদের বিবাহের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

বিষকন্যা : 'বিষকন্যা' সম্ভবত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গল্পগুলির মধ্যে একটি। এর পটভূমি আনুমানিক ৪১৩ থেকে ৩৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ শিশুনাগ বংশের রাজত্বাধীন মগধ। ইতিহাস বলে, হর্যঙ্ক বংশীয় শেষ রাজা নাগ-দাসক একদিকে যেমন ছিলেন পিতৃহন্তা, অন্যদিকে তেমন প্রজাপীড়ক। উৎপীড়িত প্রজাবর্গ তাই তার আমাত্য শিশুনাগকে

রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং মগধে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি অবন্তী রাজ্যের প্রদ্যোৎ বংশকে ধ্বংস করে মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন, এছাড়াও কাশী, কোশল এবং বৎস এই সময় সম্পূর্ণভাবে মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ববর্তী রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর মতো তিনিও মগধের সম্প্রসারণ নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনিই বৈশালীর পরিবর্তে পাটলিপুত্রকে মগধের স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত করেন এবং মগধকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

শিশুনাগের পর তাঁর পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর আমলেই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ ও গ্রিক লেখকদের রচনায় উল্লেখ আছে যে, একজন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি কালাশোক এবং তাঁর দশ পুত্রকে ছুরির আঘাতে হত্যা করেন। কিংবদন্তি অনুসারে মহাপদ্মনন্দ ছিলেন শিশুনাগ নরপতির শূদ্রাজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। সম্পূর্ণরূপে না হলেও এই ঘটনার সাথে বিষকন্যা উল্কার সঙ্গে তার পিতা চণ্ডের সম্পর্কের সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করা যায় না।

শিশুনাগ বংশের পরবর্তী সম্রাট হিসেবে নন্দীবর্ধন এবং মহানন্দীনের কথাও শোনা যায়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তার মধ্যে চণ্ড বা সেনজিতের নাম শোনা যায় না। অন্যদিকে চাণক্যের এক বিষকন্যা ছিল বলে একটি কিংবদন্তি প্রচারিত থাকলেও তার সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। এক্ষেত্রে মনে হয় যে শরদিন্দু সেই কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করেই শিবমিশ্র এবং উল্কার চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন।

ইতিহাসের উপাদান অধিক না থাকলেও ‘বিষকন্যা’ গল্পটি যে সাহিত্য হিসেবে অত্যন্ত উন্নত মানের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ‘বিষকন্যা’র কাহিনি কিছুটা এইরকম— শিশুনাগবংশের অত্যাচারী মহারাজ চণ্ডের রাজ-অবরোধে এক দাসী এক কন্যা প্রসব করেছিল। সভাপণ্ডিত এই কন্যার কোষ্ঠী গণনা করে বিধান দেন যে এই কন্যা সাক্ষাৎ বিষকন্যা এবং একে ত্যাগ করাই শ্রেয়। ফলে সেই নবজাতা কন্যা এবং তার মায়ের স্থান হল শ্মশানের গহন অন্ধকারে। এর কিছুদিন আগেই মহারাজ চণ্ডের আজ্ঞার প্রতিবাদ করায় সচিব শিবমিশ্রকেও কেবলমাত্র মস্তক বাইরে রেখে বাকি দেহ শ্মশানে পুঁতে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই নবজাতাকেও একই দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই দাসী শ্মশানে এসে শিবমিশ্রকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং শিবমিশ্র নবজাতিকাকে নিয়ে বৈশালী দেশে যাত্রা করেন।

এই ঘটনার ষোলো বছর পর শিবমিশ্র ষোড়শী উল্কাকে শিশুনাগবংশ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন। ততদিনে মগধের জনসাধারণ চণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, হিংস্র জনতা চণ্ডকে সিংহাসনচ্যুত করে তার হস্ত-পদ বিচ্ছিন্ন করে তাকে পাটলিপুত্রের দূর্গ দ্বারে শৃঙ্খলিত করে রাখে। উল্কা তাকে হত্যা করে ও পাটলিপুত্রে প্রবেশ করে। প্রেম যে সকল প্রতিশোধের আগুনকে স্তিমিত করে ‘বিষকন্যা’ গল্পটি তার প্রমাণ। সেনজিৎ উল্কাকে বৈশালীর কুহকিনী জেনেও তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং উল্কা সেনজিতের হত্যার উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রে এসেও শেষমেশ তার প্রেমে আত্মাহুতি দিয়েছিল। আর তাই কাহিনির একেবারে শেষে লেখক একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তাঁর পাঠকদের উদ্দেশে—

> “উল্কা যদি প্রিয়প্রাণহন্তি বিষকন্যাই ছিল তবে সেনজিত না মরিয়া সে নিজে মরিল কেন।”[৯]

এই প্রশ্নের মাধ্যমেই যাবতীয় রাজনৈতিক জটিলতা ও কলুষতার ঊর্ধ্বে উঠে লেখক ‘বিষকন্যা’ গল্পটিকে একটি অমর প্রেমের আখ্যান করে তোলেন।

শঙ্খ-কঙ্কণ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ লেখনীর আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ হল ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’। আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান ইতিহাসের এক বহুল প্রচলিত ঘটনা, তবে তাতে পঞ্চমপুরের রাজকুমারী হরণ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। আলাউদ্দিন খিলজীর নারীলালসাও ইতিহাসের বহু কালিমালিপ্ত একটি অধ্যায়। আর ইতিহাসের সেই অন্তরালকেই লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন। আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় এবং নারী-লালসা— এই দুই বিন্দুকে এক করে লেখক ‘শঙ্খ-কঙ্কণে’র সরলরৈখিক গল্প রচনা করেছেন। কাহিনির টানে গল্পে এসেছে মালিক কাফুরের মতো ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে ইতিহাস নয়, খিলজীর বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট রাজ্যের প্রতিশোধের রূপকথা রচনাই ছিল এখানে লেখকের উদ্দেশ্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এ প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন খিলজী ও তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে— আলাউদ্দিন ছিলেন জালালউদ্দিনের ভ্রাতা শিহাবউদ্দিনের পুত্র— অর্থাৎ জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র। আবার তার সাথে জালালউদ্দিনের কন্যার বিবাহও হয়, সেই সূত্রে আলাউদ্দিন ছিলেন জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজীর জামাতা। জালালউদ্দিন যখন দিল্লির সিংহাসনে বসেন, তখন থেকেই আলাউদ্দিনের উত্থান শুরু হয়। প্রথমে তিনি 'আমীর-ই-তুজুক' পদে উন্নীত হন, এরপর কারা-মানিকপুরের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। এই সময় আলাউদ্দিনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব হল দেবগিরি অভিযান। ভিলসা লুণ্ঠনের সময় তিনি দক্ষিণ ভারতের দেবগিরির ধন সম্পদের সংবাদ পেয়েছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দুশো মণ স্বর্ণ, আড়াই মণ মুক্তো, আধমণ মণি, তিনশো পঁয়তাল্লিশ মণ রৌপ্য এবং হাজার খানেক রেশম বস্ত্র দিয়ে আলাউদ্দিনের সাথে সন্ধি করেন। এরপর আলাউদ্দিন, তাঁর শ্বশুর জালালউদ্দিনকে হত্যা করে দিল্লির সুলতান পদে আসীন হন।

সুলতান হয়ে আলাউদ্দিন পর্যায়ক্রমে গুজরাট, রণথম্বোর, চিতোর, মালব ও রাজপুতানার অন্যান্য অংশ জয় করেন। গুজরাট জয়ের সময় আলাউদ্দিনের প্রচুর ধনসম্পদের সাথে সাথে বাঘেলা বংশীয় রাজা কর্ণদেবের রাজমহিষী কমলাদেবী ও মালিক কাফুর নামে এক সুদর্শন ক্রীতদাসকেও লুণ্ঠন করে আনেন। আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন ও তাকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ে এই মালিক কাফুর-ই সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রথমেই ক্ষুব্ধ আলাউদ্দিন ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র বিনা যুদ্ধে কর প্রদানে স্বীকৃত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শংকরদেব বিদ্রোহী হন। মালিক কাফুর সেই বিদ্রোহ দমন করে রাজকন্যা দেবলাদেবীকে দিল্লিতে প্রেরণ করেন। এরপর কাফুর ওয়ারঙ্গল আক্রমণ করে রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবের বশ্যতা লাভ করেন এবং তাঁরই সহায়তায় হোয়সলরাজকে পরাজিত করেন। এরপর মালিক কাফুর পাণ্ডুরাজ্য আক্রমণ করেন এবং মাদুরা ধ্বংস করেন। দাক্ষিণাত্য বিজয় আলাউদ্দিন খিলজীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত জয় করে তিনি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে দক্ষিণ ভারত বিজয় খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না, কারণ দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না এবং তাদের সামরিক শক্তিও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার জন্য দেশরক্ষার তুলনায় জাতরক্ষাই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবার আমাদের মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যাক।

গল্পের কাহিনি বিন্যাস কিছুটা এইরূপ– আলাউদ্দিন খিলজী তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের পথে সৈন্যদলের বিশ্রামের জন্য পঞ্চমপুরে শিবির ফেলেন। কতিপয় অত্যাচারের পর একদিন তিনি রাজা ভূপ সিংহকে তলব করে জানান যে, ভূপ সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিলাবতীকে আলাউদ্দিন খিলজীর কাছে সওগাত পাঠাতে হবে। রাজ্যের মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে তিনি শিলাবতীর পরিবর্তে সীমন্তিনী নামে এক রূপসী দাসীকে খিলজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের চোখে ধুলো দেওয়া এতো সোজা নয়। সপ্তাহকাল পরে তিনি সীমন্তিনীকে ফিরিয়ে দিয়ে শিলাবতীকে নিয়ে যান। এই শোক সহ্য করতে না পেরে রাণী উষাবতী সূতিকাগৃহেই মারা যান এবং আট বছর পরে আলাউদ্দিন খিলজীর জল্লাদের হাতে তাঁর পুত্র রামরুদ্রের মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার সতেরো বছর পর ময়ূর কর্মসংস্থানের আশায় পঞ্চমপুরের অভিমুখে যাত্রা করে। ময়ূরের অতীত সম্পর্কে লেখক গল্পে বিস্তারিত কিছু জানাননি। ময়ূরের জবানবন্দিতে শুধু এটুকুই জানা যায় যে, সে একদা দেবগিরিতে বসবাস করত। সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে তার পিতার মৃত্যু হয় এবং এর কিছু বছর পর তার মাতাও পরলোকগমন করেন। সে তার গোত্র পরিচয় কিছু জানে না, শুধু জানে সে জাতিতে ক্ষত্রিয়। তার অসাধারণ ধনুর্বিদ্যা দেখে রাজা ভূপ সিংহ ও ভট্ট নাগেশ্বর অভিভূত হয়ে যান। ময়ূরকে কেন্দ্র করে রাজা পুনরায় প্রতিশোধের ছক কষতে থাকেন এবং যথা সময়ে ময়ূরের সাথে সীমন্তিনী ও আলাউদ্দিনের কন্যা চঞ্চরীকে দিল্লিতে প্রেরণ করেন। পথে এক পান্থশালায় অভূতপূর্বভাবে ময়ূরের সঙ্গে দেখা হয় ভূপ সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিলাবতীর। সে জানতে পারে, রাজকুমারী শিলাবতী, কবুতর বিবি নামক এক দাসীর সাহায্যে দিল্লীর হারেম থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং দীর্ঘ চোদ্দ বছর এই পান্থশালায় ছদ্ম পরিচয়ে বসবাস

করছেন। এরপর ময়ূর শিলাবতীর সাহায্যে সুকৌশলে চঞ্চরীকে আলাউদ্দিনের হারেমে প্রতিষ্ঠিত করে। আলাউদ্দিন নিজ ভোগতৃষ্ণায় অনেক অন্যায় করেছেন, শুধু নিজ ঔরসজাতা কন্যার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে তিনি ঘোর পাপ বলে মনে করতেন। আলাউদ্দিনকে সেই পাপে নিমজ্জিত করাই ছিল ভূপ সিংহের চরমতম প্রতিশোধ।

‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ স্বল্প দৈর্ঘ্যর গল্প নয়, বরং এর মধ্যে উপন্যাসের যাবতীয় গুণাগুণ বর্তমান আছে। শরদিন্দুর অধিকাংশ গল্পের মতো এখানেও ‘Poetic Justice’-এর একটি ভাব লক্ষ করা যায়। অবশ্যই, এর ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, কিন্তু কাহিনি-বিন্যাসের দিক থেকে এর অসাধারণত্ব নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে গভীর ইতিহাস-প্রেম থেকেই শরদিন্দু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি রচনা করতে শুরু করেছিলেন। তবে তিনি ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করে যাওয়ার তাগিদ তাঁর ছিল না, বরং ইতিহাসকে ব্যবহার করে তার মধ্যে সাহিত্য ও রোমান্সের রসকে পরিস্ফুট করে তোলাই তাঁর কাজ ছিল। আর তাই ইতিহাসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে কিছু বিশেষ ‘লুপহোল’ খুঁজে বের করে, তিনি সেগুলিকে তাঁর কল্পনারসে সিঞ্চিত, চিত্রিত ও ভরাট করেছেন। বলাই বাহুল্য, সেই চিত্রগুলি শুধুমাত্র যে বাংলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছে তাই নয়, পাঠক হিসেবে আমাদের অন্তরাত্মাকেও তৃপ্ত করেছে। একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি ইতিহাসকে ভালোবাসেন বলে তাঁর গল্পগুলিকে কেবল ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করেননি, বরং তার উল্টোটাই হয়েছে। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’-এর মতো গল্পে যেখানে ইতিহাসের সঙ্গে ঘটনার যোগসাজস থাকার সম্ভাবনা নিতান্তই কম, সেখানেও লেখক এমনভাবেই ঘটনা-প্রবাহকে চিহ্নিত করেছেন যে কোথাও গিয়ে আমাদের গল্পটিকে অলীক বলে মনে হয় না। বরং ইতিহাসের উর্ধ্বে গিয়ে গল্পটি বীরত্বের ও মানবমনের চিরআখ্যান হয়ে উঠেছে। আর এখানেই তিনি তাঁর পূর্বসূরি এবং সম্ভবত সমস্ত উত্তরসূরি ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনাকারদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তিনি বাস্তব ও ইতিহাসের এমন এক সমানুপাতিক মিশ্রণ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা ভূতপূর্ব হয়েও বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গল্প বলে, যা অতীত হয়েও অবিনশ্বর থেকে বাঙালি পাঠকের মনে অমলিন স্থান গ্রহণ করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮. পৃ. ৮৩৪
২. তদেব, পৃ. ৮৩১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫১. পৃ. ৬৭৭
৪. তদেব, পৃ. ৬৭৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৭
৬. তদেব, পৃ. ৪২
৭. তদেব, পৃ. ১১০
৮. তদেব, পৃ. ১০৭-১০৮
৯. তদেব, পৃ. ১৬৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮
ডঃ গৌতম নিয়োগী, গৌরদাস হালদার, ভারতবর্ষের ইতিহাস [প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দী], কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০০৪
শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮

সহায়ক গ্রন্থ :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫১

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গি বণিক, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

Rama Shankar Tripathi, History of Ancient India, Benaras, Nanda Kishore & Bros, 1942

সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪-১৩৩৮ খ্রীঃ), কলকাতা, সাহিত্যলোক, জুন, ১৯৯৮

M.N Pearson, The Portuguese in India, Kolkata, Cambridge University Press, 1987

Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, Kolkata, Cambridge University Press, 1996

R.S Sharma, India's Ancient Past, Kolkata, Oxford University Press, 2005

Romila Thapar, Early India : From the origins to AD 1309, Oakland, University of California Press, 2002

Satish Chandra, Medieval India : From Sultanate to the Mughals, 1206-1526, New Delhi, Har-Anand Publications Private Limited, 2004

Peter Jackson, The Delhi Sultanate : A Political and Military History, Kolkata, Cambridge University Press, 1999

Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India, London, Pearson Publication, 2008

Hayden White, The Content of the Form : Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987

সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪-১৩৩৮ খ্রীঃ), কলকাতা, সাহিত্যলোক, জুন, ১৯৯৮